জীবন ব্যবস্থা
মৌলিক অধিকার
মানবাধিকার
স্বাধীনতা
সমঅধিকার
তাকওয়া
জাতীয়তাবাদ
ইনসাফ
অমুসলিমের অধিকার
রাজনৈতিক অধিকার
অর্থনৈতিক অধিকার
ধর্মীয় স্বাধীনতা

শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ

অনুবাদ | আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

حُقُوْقُ الإِنْسَانِ فِى الْإِسْلاَمِ

ইসলামে মানবাধিকার

মূল: শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ
সাবেক ধর্মমন্ত্রী, সউদী আরব

অনুবাদক: আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্সে সেন্টার, সউদী আরব

সম্পাদক: শাইখ আবদুল্লাহ আল কাফী বিন আব্দুল জলীল
দাঈ, জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্সে সেন্টার, সউদী আরব

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالْصَّلاةُ وَالْسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

ইসলাম এমন একটি জীবন ব্যবস্থার নাম যেখানে সর্বশ্রেণীর মানুষের অধিকার সংরক্ষিত রয়েছে। ছোট, বড়, নারী, পুরুষ, ধনী, গরীব, মালিক, শ্রমিক, মুসলিম, অমুসলিম সকলকে দেয়া হয়েছে তাদের যথাযথ অধিকার। মানুষের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সকল প্রকার অধিকার দেয়া হয়েছে। কারণ,যে আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্বচরাচরের স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক তিনি তাঁর সৃষ্টি জগতের যাকে যখন যা দেয়া প্রয়োজন তাকে তখন তাই দিয়েছেন। তিনি কারও প্রতি সামান্যতম অবিচার করেননি।

সউদী আরবের সাবেক ধর্ম মন্ত্রী শাইখ সালিহ বিন আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ 'মানবাধিকার' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় 'ইসলামে মানবাধিকার' শিরোনামে এক জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। বক্ষ্যমাণ পুস্তকটি সেই বক্তৃতারই সংকলন। মূল্যবান এই বক্তব্যটি থেকে যেন বাংলাভাষী মানুষেরা মানবাধিকার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতে পারে এবং ইসলাম সম্পর্কে নানা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সচেতন হতে পারে সে উদ্দেশ্যই তা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হল।

এখানে তিনি জাতিসঙ্ঘ এবং পাশ্চাত্য প্রণীত মানবাধিকার প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক এ বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি তার বক্তৃতায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে,মানবাধিকার সম্পর্কে পাশ্চাত্যের দাবি অন্তঃসার শূন্য ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই তা বাস্তবায়ন করেনি। এ ছাড়াও তিনি এতে নারী-পুরুষের সমধিকার, গণতন্ত্র, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা, ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন এবং সরকারের মুসলিমদের করণীয় ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন।

মোটকথা অত্র বক্তৃতায়,তিনি অন্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর অত্যন্ত চমৎকার ও সাবলীলভাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। সুতরাং অত্র

বইটি পাঠ করলে পাঠক-পাঠিকাগণ,মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের সৌন্দর্য মণ্ডিত বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে পারবেন। সেই সাথে আমাদের সমাজে ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচারের ফলে হৃদয় পটে জমে থাকা নানা ভুল ধারণার অবসান ঘটবে ইন শা আল্লাহ।

বইটি পাঠ করতে গিয়ে কোথাও অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে,নিঃসংকোচে তা আমাদেরকে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ রইল। জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

বিনীত অনুবাদক:

আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল

(লিসান্স,মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,সউদী আরব)

দাঈ,জুবাইল দাওয়াহ এন্ড গাইডেন্স সেন্টার,সউদী আরব

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, পরিচালক, সুবিজ্ঞ, অসীম কুশলী মহিয়ান আল্লাহর যিনি জ্ঞানের অধার মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলেছেন,

﴿وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا﴾

নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সৃষ্ট বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৭০

সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি তার সৃষ্টি সম্পর্কে অবগত। তিনি অতি সুক্ষ্মদর্শী এবং সব কিছুর খবর রাখেন। তার সকল আদেশ, নিষেধ, আইন-কানুন, নির্দেশনা সব কিছুতেই তার গুণগান বর্ণনা করছি। তিনিই মানুষকে সে সব বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে তাদের ইহ ও পরকাল উভয় জগতে রয়েছে কল্যাণ । প্রচুর পরিমাণ প্রশংসা আল্লাহর যার অবদান আমাদের উপর অগণিত।

আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নেই। তিনি অদ্বিতীয়। তার কোন শরীক নেই। আরও স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তার প্রতি, তার পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি অবারিত ধারায় রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। অতঃপর,

প্রত্যেক মুসলিমের যে বিষয়টির প্রতি আগ্রহ রাখা দরকার তা হল, দীনের অজানা বিষয়ে জ্ঞানার্জন করা অথবা যে বিষয়গুলো কালপরিক্রমায় নানা কর্ম ব্যস্ততায় ভুলে গেছে বা ভুলার উপক্রম হয়েছে সেসব বিষয়ের জ্ঞানকে মজুবত করে নেয়া।

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও চিরন্তন জীবন ব্যবস্থার নাম

এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলাম এমন একটি বরকতময় জীবন ব্যবস্থার নাম, মানব জাতির জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান কখনও আসে নি। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নাবীর জন্য এক একটি শরী'আত ও জীবন-বিধান দান করেছিলেন। কিন্তু তিনি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরী'আতকে সবচেয়ে পরিপূর্ণ করেছেন। এটি কিয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। এই শরী'আত যে কোন স্থান, কাল, পরিবেশ ও পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ﴾

আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।" সূরা মায়িদাহ ৫:৩

কারণ, ইসলামী শরী'আতে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান। ইসলামী শরী'আতে প্রতিটি মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিটি মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে আর মুসলিম হিসেবে মুসলিমকে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কারণ, শরী'আত তাওহীদ বা একত্বের বার্তা বহণ করে।

ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার প্রয়োজনীয়তা

সবার জন্য ইসলামী শরী'আতের সৌন্দর্য মণ্ডিত দিকগুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি শরী'আতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, হুকুম-আহকাম এবং রহস্য-তাৎপর্য সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে ইসলাম প্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করা দরকার। কেননা এতে করে সে সব অধিকার সংরক্ষণ করার পাশাপাশি মানুষকে সে দিকে আহবান করতে মনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হবে। শুধু তাই নয় বরং যারা নানা

শ্লোগান আর বিভিন্ন নামে-বেনামে মানুষকে সত্যের পথে বাধা দিতে চায় সে সব ভ্রান্ত আহবানকারীদের বক্তব্যগুলো নীরবে না শুনে সেগুলোর যথোপযুক্ত জবাব দেয়া যাবে।

সুতরাং আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি আমাদেরকে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ এবং শিক্ষার আলোকে এই শরী‘আতের অনুসারী বানিয়েছেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে অধিকার দু’প্রকার

আল্লাহ তা‘আলা দু’প্রকার অধিকারের ভিত্তিতে সাত আসমান এবং জমিন সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো হলো:

- **এক. আল্লাহর হক**
- **দুই. বান্দার হক**

আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সকল নাবী এবং সকল আসমানী কিতাব এই দুই প্রকার অধিকার বর্ণনার জন্যই আগমন করেছে।

- **আল্লাহর হক:** আল্লাহর হক বলতে বুঝায় যে, সকল প্রকার ইবাদত পাওয়ার একমাত্র হকদার আল্লাহ তা‘আলা। তিনি ছাড়া কেউ ইবাদত পাওয়ার হকদার নয় তাই একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করা এবং সকল প্রকার আল্লাহ বিরোধী অপশক্তি এবং তাগূতকে অস্বীকার করা। সেই সাথে আল্লাহ তা‘আলা যখন যেখানে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তখন সেখানে তাঁর আনুগত্য করা।
- **বান্দার হক:** আল্লাহর হক আদায় করার পরই সৃষ্টিজগতের হক আদায় করতে হয়।

এ দুটি মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্যই আল্লাহ তা‘আলা যুগে যুগে আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং নাবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾

"আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়-নীতি,যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে।" সূরা আল হাদীদ ৫৭:২৫। তিনি আরও বলেন,

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِي كُلِّ أُمَّةٖ رَّسُولًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنِبُواْ ٱلطَّٰغُوتَۖ ﴾

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে,তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগূত থেকে নিরাপদ থাক।" সূরা নাহল **১৬:৩৬**

এ জন্যই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেছিলেন, "হে মুয়ায, তুমি কি জানো বান্দার ঊপর আল্লাহর হক কি? এবং আল্লাহর উপর বান্দার হক কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন, বান্দার উপর আল্লাহর হক হল, বান্দা তার ইবাদত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহর উপর বান্দার হক হল, তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক না করলে আল্লাহ তাঁকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি কি লোকদের এ সুসংবাদ দিব না? তিনি বললেন,তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও না, তাহলে লোকেরা (এর উপরই) নির্ভর করে বসে থাকবে।"[১]

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুগে যুগে সকল শরী'আত বিশেষ করে ইসলামী শরী'আতের আগমন ঘটেছে আল্লাহর অধিকার অতঃপর সৃষ্টিজগত তথা মানুষের অধিকার বাস্তবায়নের জন্য। আপনি যদি কুরআন, হাদীছ এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন অধ্যয়ন করেন তবে এ বিষয়টি আপনার সামনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হবে।

---

[১] ছ্বহীহ বুখারী, হা/ ২৮৫৬, ও মুসলিম, হা/ ৩০

মানবাধিকার (Human rights)

বর্তমান যুগে যে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে সেটি হল, হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার। এই বিষয়টি আমাদের আলোচনার শিরোনাম। এর সাথে শরীয়াহ, আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত, বিচারাচার, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সংক্রান্ত বহু অধিকার জড়িত। অন্যদিকে এটি বৃহৎ রাষ্ট্র সমূহ বা জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক রচিত 'হিউম্যান রাইটস কনভেনশন' বা মানবাধিকার সনদ এর সাথেও সম্পর্কযুক্ত।

মানবাধিকার কথাটি কোথা থেকে আসল?

আপনারা জানেন যে, হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার শব্দটি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে ঘটনা রয়েছে। এটি আধুনিক শব্দ। কুরআন-সুন্নাহ কিংবা পূর্ববর্তী ইমাম ও ইসলামী স্কলারগণের লিখুনিতে এ শব্দটি উল্লেখিত হয়নি। অথচ এ সকল অধিকারের কথা কুরআন ও সুন্নায় আগে থেকেই বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকার নেতৃত্বাধিন জোট বিজয়ী হলে ''জাতিসঙ্ঘ নামক একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের জন্য নতুন একটি সংবিধান তৈরি করা হল। যার নাম 'নিউ ওয়ার্লড ওর্ডার' (New World Order)। সুতরাং এ শব্দটি উপসাগরীয় যুদ্ধের পরের সৃষ্টি নয় বরং এর মূল ভিত রচিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই। শক্তিধর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো অন্যান্য জাতি, রাষ্ট্র বা বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষদের উপর তাদের আইন-কানুন চাপিয়ে দিতে এটি ব্যবহার করত।

সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে তারা একটি নতুন আইন-কানুন সম্বলিত সংবিধান প্রণয়ন করল, যেন পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলো অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোর উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন দিক দিয়ে হয়। কখনো হয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, কখনো হয় স্বাধীনতা চর্চার দিকে দিয়ে, কখানো যে দেশে তারা হস্তক্ষেপ করতে চায় সে দেশে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রে।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক রচিত নিউ ওয়ার্লড ওয়ার্ডার ' (New World Order) এর অন্তর্গত একটি ঘোষণার নাম হল ইউনিভার্সাল

ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস (Universal Declaration of Human Rights) বা মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা। এটিতে ৩০টি পয়েন্ট রয়েছে। পরবর্তীতে এর মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। এই পরিবর্ধিত সনদটির নামই হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার।

জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত মানবাধিকারের মৌলিক দিকসমূহ

বর্তমানে জাতিসংঘ এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলো যে 'হিউম্যান রাইটস' বলে হাঁকডাক চালাচ্ছে তাতে মূলত দুটি দিক রয়েছে। যথা:

১. স্বাধীনতা
২. নারী-পুরুষের সমধিকার

এর মধ্যে আরও যে সব বিধিবিধান রয়েছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল, সকল প্রকার দাসত্বপ্রথার বিলুপ্তি। দাসত্বপ্রথা একটি অন্যায় কাজ। এটি চালু রাখা অবৈধ। এরপর তারা স্বাধীনতাকে বিভিন্নভাবে শ্রেণী বিন্যাস করেছে। যেমন, ব্যক্তি স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা, সমঅধিকার, বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, অধিকার ও নাগরিকত্ব।

নারী-পুরুষের মাঝে সমতা সহ বর্ণ ও দেশের ভিন্নতা সত্বেও সর্বস্তরের মানুষের মাঝে সমতা থাকবে। মানুষ যে দেশে ইচ্ছা সে দেশে বসবাস করতে পারবে...ইত্যাদি। এসব কিছুর মূলে রয়েছে, উপরোক্ত দুটি নীতি: ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সব মানুষের সমান অধিকার।

উক্ত সনদে যে সব ধারা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মধ্যে অন্যতম হল, মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে নির্ধারিত কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলতে হবে এবং কিছু বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে।

এই ধারাটির মাধ্যমে জাতিসঙ্ঘ এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলো অনেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে এবং তাদের উপর বেশ কিছু আইন চাপিয়ে দিয়েছে। এমন কি যে সব রাষ্ট্র এই সব অধিকার বাস্তবায়ন করছে না তারা তাদের নামও ঘোষণা করেছে। তারা কখনো কখনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার থেকে বড় বড় বিষয়েও হস্তক্ষেপ করেছে।

অনেক সময় তারা ব্যক্তি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করেছে যে, তোমরা এ সব স্বাধীনতা কতটুকু বাস্তবায়ন করেছো?

অনুরূপভাবে তারা রাজনৈতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে গিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ডাক দিয়ে বলেছে, জানগণ নিজেরাই নিজেদের শাষণ প্রতিষ্ঠা করবে! এভাবে তারা পাশ্চাত্যের দেশগুলোর আদলে নির্বাচন পরিচালনা ও পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপরতা চালিয়েছে।

স্বভাবতই যে সব জাতি নিজেরা সচেতন নয় তাদের মধ্যে এই সব মূলনীতি ও আদর্শ ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সহজ। এসব দেশে এমন ব্যক্তিকে ক্ষমতার মসনদে বসানো হয় যে হবে পাশ্চাত্বের অনুগামী। বিশেষ করে তারা সে সব দেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে সব দেশে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে; যারা কোন প্রকার সম্রাজ্যবাদকে মেনে নেয় নি। 'হিউম্যান রাইটস' ঘোষণার প্রেক্ষাপট ও কিছু কারণ রয়েছে। আর রয়েছে এমন কিছু উদ্দেশ্য যেগুলোকে সম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে।

ইসলামে মানবাধিকার

বর্তমানে মানবাধিকার শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক মুসলিমের উচিত তার দীন নিয়ে গর্ববোধ করা এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যে, মানুষকে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অধিকার দেয়া হয়েছে তা অনেক বড়। কারণ, কিসে মানুষের কল্যাণ রয়েছে সে ব্যাপারে এবং সৃষ্টিজগত সম্পর্কে আল্লাহর চেয়ে বেশি কেউ জানে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿أَلَا يَعۡلَمُ مَنۡ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ﴾

যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মজ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত। সূরা মুলক ৬৭:১৪

সুতরাং মহান আল্লাহ শরী'আতের মধ্যেই 'মানবাধিকার' সুরক্ষা করেছেন। তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করেছেন।

তাই অনেকেই মানবাধিকার নিয়ে গবেষণা করে এ কথা প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী শরী'আত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন-চরিত, কুরআন-সুন্নাহর বিধানাবলী, চার খলীফা ও তৎপরবর্তী খলীফাদের কর্মপদ্ধতি হল, মানবাধিকারের পূর্বতন সনদ। ইসলামের এই মানবাধিকারগুলো একদিক দিয়ে অভূতপূর্ব এবং অতি উঁচুমানের আবার অন্যদিকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও উন্নত মানসম্পন্ন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তা পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। গবেষকগণ এ বিষয়ে পর্যাপ্ত লেখালেখি করেছেন।

গবেষকদের দৃষ্টিতে জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত মানবাধিকার

গবেষকদের মধ্যে অনেকেই জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকারকে দুর্বল দৃষ্টিতে দেখেছে। তারা এ কথা বলতে চেয়েছে যে, এই মানবাধিকার সনদের প্রতিটি বিষয় ইসলামী ইতিহাস এবং ইসলামী শরী'আতে আগে থেকেই ঘোষিত হয়ে আছে। এমন কি দাস প্রথার বিলুপ্তি এবং নারী-পুরুষের সমতার বিষয়টিও। তারা এ দুটি বিষয়ের পূর্ব নজির এবং প্রচলন বের করার চেষ্টা করেছেন।

তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিষয়টিকে প্রবন্ধ আকারে জ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন, পাশ্চাত্যে যে মানবাধিকার বাস্তবায়ন করা হয় বা জাতিসঙ্ঘ যেটা ঘোষণা করেছে সেটার মধ্যে কিছু বিষয় আছে শরী'আত সম্মত আর কিছু আছে যা মূলত শরী'আতের সাথে এমন কি সুস্থ বিবেক-বিবেচনার সাথেও সাংঘর্ষিক। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন সকল বিধিবিধান তার নিকট থেকেই গ্রহণ করি। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ﴾

"আর আমি আদেশ করছি যে,আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির

অনুসরণ করবেন না এবং তাদের থেকে সতর্ক থাকুন-যেন তারা আপনাকে এমন কোন নির্দেশ থেকে বিচ্যুত না করে,যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। সূরা মায়িদাহ ৫:৪৯ । তিনি আরও বলেছেন,

﴿إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۚ أَمَرَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُۚ﴾

আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে,তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। সূরা ইউসুফ ১২:৪০

যেভাবে জ্ঞান ও তত্ত্বগত (Theoretical) বিষয়ে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে সেভাবে বাস্তব কর্মক্ষেত্রেও আল্লাহর বিধান অনুসরণ করতে হবে।

তাই অত্র আলোচনায় মানবাধিকার সম্পর্কে সব কিছু ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে ইসলামী শরী‘আতের মূলনীতিগুলো বোধগম্য করে তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

পাশ্চাত্যের মানবাধিকারের মধ্যে মুসলিমদের কোন কল্যাণ নেই

পাশ্চাত্য এবং তাদের অনুসারীরা সম্রাজ্যবাদী এবং ইসলামের দুশমনদের অভিপ্রায় অনুযায়ী যে মানবাধিকার দেয়ার আহবান জানাচ্ছে তা অনুসরণে ইসলাম ও মুসলিমদের কোন ফায়দা নেই। বরং তা মুসলমানদের বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপ করার পথ খুলে দিবে। শুধু তাই নয় বরং এটি মুসলিমদেরকে তাদের দীন ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত করে পশ্চ্যাতের অনুসরণীয় তথাকথিত স্বাধীনতা, সামাজিক সমতা, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী, রাজনৈতিক ব্যাপারাদি ইত্যাদির দিকে টেনে নিয়ে যাবে।

সব অধিকারের মূল হল, মানবাধিকার

মানবাধিকারের উৎস হল আল্লাহর এ বাণীটি:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ﴾

"নিশ্চয় আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি।" সূরা ইসরা ১৭:৭০

আলিমগণ বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দু'ভাবে মর্যাদা প্রদান করেছেন। যথা:

এক. তিনি সৃষ্টি ও গঠনগতভাবে মানুষকে সম্মানিত করার পাশাপাশি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সব তার আওতাধীন করে দিয়েছেন।

দুই: তিনি মানুষকে অন্য সকল প্রাণীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। জীবন ধারণ, মানুষের সাথে সুসম্পর্ক, আরাম-আয়েশ ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব কিছুতেই তিনি মানুষকে অন্য সকল প্রাণীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

আর অন্যান্য প্রাণীকুলের উপর মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের অধিকার সংক্রান্ত শরী'আতের বিধানগুলো এসেছে।

পাশ্চাত্যের নিকট 'মানবাধিকার' দ্বারা উদ্দেশ্য এবং তাদের দাবির অসারতা:

মানবাধিকার বলতে পাশ্চাত্য বা তাদের অনুসারীদের নিকট দু'টি জিনিস বুঝায়। যথা:

ক) স্বাধীনতা (Freedom)
খ) সমতা বা সমানাধিকার (Equality)

ক. স্বাধীনতা (Freedom): তারা যে স্বাধীনতা (Freedom) বলে হাঁকডাক দিয়ে বেড়াচ্ছে প্রকৃত পক্ষে তাদের নিজেদের দেশেও সে স্বাধীনতা নেই। কারণ, শর্তহীন স্বাধীনতার মানে হল, মানুষ যা খুশি তাই করবে। কারও নিকট তাকে জবাবদিহী করতে হবে না।

বরং এ স্বাধীনতা পৃথিবীর কোথাও নেই। যেখানে স্বাধীনতা আছে সেখানে স্বাধীনতার একটি সীমা রয়েছে। সেই সীমা পর্যন্ত যাওয়ার পর বলা হবে- নিষিদ্ধ, তুমি এখানে স্বাধীন নও।

এ থেকে আপনি বুঝতে পারছেন যে, দুনিয়ার বুকে পূর্ণ স্বাধীনতা কোথাও নেই। যা আছে তা আংশিক। সম্পদ, রাজনীতি, বিচার, ব্যক্তিগত আচরণ, রক্ত, সন্তান-সন্তুদি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে শর্তহীন স্বাধীনতা পৃথিবীর কোথাও নেই। বরং একেক দেশে একেক ভাবে স্বাধীনতা দেয়া আছে। কোথাও কম কোথাও বেশি।

তারা যে 'মানবাধিকার' এর দাবি করছে তার একটি অংশ এই স্বাধীনতা কথাটি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি তাদের নিকটও নেই। কেননা, এর সাথে তারা নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন শর্ত জুড়ে দিয়েছে। সুতরাং এই সব শর্ত যুক্ত করায় স্বাধীনতা কথাটি মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে।

মানুষকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী স্বাধীনতা দাও তাহলে স্বাধীনতা গ্রহণযোগ্য হবে এবং প্রকৃত স্বাধীনতার পক্ষে তোমার আহবান যথার্থ হবে। কিন্তু যদি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য আইন-কানুনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে মানুষের অর্থ-সম্পদ লোপাট করা হয় এবং মানুষের ক্ষমতাকে খর্ব করা হয় তখন তা প্রকৃত স্বাধীনতা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

তাহলে মানবাধিকারের অন্তর্গত যে স্বাধীনতার দিকে আহবান জানানো হচ্ছে তা আমাদেরকে অবশ্যই এ দৃষ্টিতে দেখতে হবে যে, শর্তহীন স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই বরং তা হতে হবে অবশ্যই শর্তসাপেক্ষ। অর্থাৎ মানুষ চলাফেরা ও আচার-আচরণের পৃথিবীর সর্বত্র পূর্ণ স্বাধীন নয়। বরং তার স্বাধীনতার একটি সীমানা বেঁধে দেয়া হয়েছে যেগুলো তারা বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে থাকে। আর এ জন্যই তারা প্রোটকল (Protocol) এবং ইটিকেট (Etiquette-শিষ্টাচার/আদব-কায়দা) নামক বিষয়গুলোর পাশাপাশি বিভিন্ন নামের কিছু নিয়ম-নীতি সামনে নিয়ে এসেছে। কেউ এসব নিয়ম-নীতি না মানলে তাকে সরকারী অনুষ্ঠানে প্রবেশে বাধা দেয় হয়। বাধা দেয়া হয় যে কোন স্থানে মানুষকে তার নিজস্ব পোশাকে আসতে, যে কোন অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে বা কথা বলতে।

তাহলে সব জায়গায় কিছু না কিছু স্বাধীনতা অনুপস্থিত আছে। এর কারণ, তারা মনে করে, মানুষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া ঠিক নয়-কোথাও শালীনতার পরিপন্থী হওয়ার কারণে, কোথাও সম্পর্কের পরিপন্থী হওয়ার কারণে, কখনো অন্য অধিকারের পরিপন্থী হওয়ার করণে...।

সুতরাং মূলকথা হল, 'মানবাধিকার' এর অন্তর্গত এই 'স্বাধীনতা' *(*Freedom) শর্তহীন নয় অর্থাৎ মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীন কখনও হতে পারে না।

খ. সমতা বা সমানাধিকার (Equality): তারা যে **সমানাধিকার সমানাধিকার** বলে হাঁকডাক করছে তার অর্থ হল, সব কিছুতে নারী-পুরষের সমান অধিকার। অর্থাৎ অধিকার প্রদান ও গ্রহণ উভয় ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। কাজের বিনিময়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, ভ্রমন, দেশের মধ্যে যেখানে খুশি বসবাস, দাস প্রথার বিলুপ্তি ইত্যাদি সব কিছুতেই নারী-পুরুষ অভিন্ন।

এ 'সমতা'র কিছু বিষয় গ্রহণযোগ্য আর কিছু বিষয় প্রত্যাখ্যানযোগ্য (সামনে এ বিষয়ে আলোচনা আসবে ইন শা আল্লাহ)। আমরা এখানে উক্ত ঘোষণাপত্র কিংবা তার সংশোধিত ও পরিবর্ধিত বিষয়ে সমালোচনা করব না, বরং আমি এখানে আল্লাহ প্রদত্ত মানুষের পূর্ণ ও সুউচ্চ অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

মানব রচিত মানবাধিকারের দুর্বলতা

মানুষ মানুষকে অধিকার দিতে গেলে প্রবৃত্তির তাড়না থেকে বাঁচতে পারে না। যে আইন রচনা করে -সে যেই হোক না কেন- আইনের মধ্যে নিজের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে ঢুকিয়ে দেয়। তাই দেখা যায়, পাশ্চাত্যের আইনগুলো (যেমন ফ্রান্স বা আমেরিকার আইন) মাঝে মধ্যেই পরিবর্তন হয়। কেননা, প্রথম যখন আইন তৈরি করা হয় তখন তা ছিল বিশেষ স্বার্থে। সেটা তৈরী হয়েছিল দেশের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্য বা কোন ব্যাপারে রাষ্ট্রের অহমিকা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। সময়ের সাথে সাথে

পরিস্থিতিরও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই আইন পরিবর্তন করারও প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

এ কারণে আল্লাহ তা‘আলা জাহেলী শাসন ব্যবস্থাকে প্রবৃত্তির শাসন হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُۖ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلۡحَقِّۚ﴾

“অতএব,আপনি তাদের পারস্পারিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফয়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে, তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।” সূরা মায়িদাহ ৫:৪৮

কেননা যখন কোন আইন শরী‘আতের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তখন বুঝতে হবে নিশ্চিতভাবেই তাতে প্রবৃত্তির প্রাধান্য বিস্তার করেছে। যার কারণে তা নির্ভুল হয়নি। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন মানবিক কুপ্রবৃত্তি প্রাধান্য পাবে তখন কোনভাবেই মানুষের যথার্থ অধিকার প্রদান করা সম্ভব নয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মানবাধিকারের উপরোক্ত মূলনীতিগুলো তৈরী করা হয়েছে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে। যেগুলো মানবিক কুপ্রবৃত্তির অনুপ্রবেশ থেকে মুক্ত নয়। অথবা সেগুলো ছিল রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষার চিন্তায় কিংবা সামরিকভাবে দুর্বল অথচ সম্পদশালী দেশগুলো উপর ক্ষমতা বিস্তারের আগ্রহে।

ইসলাম এসেছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি এবং জুলুম ও নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য

আপনি যদি দেখেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়তের আগে আরবে-মক্কা ও পার্শবর্তী অঞ্চল সমূহে, আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া, ইরাক, মিসর, পারস্য, রোম ইত্যদি পৃথিবীর দিকে দিকে মানুষের কী অবস্থা ছিল তাহলে দেখতে পাবেন যে, মানুষের অধিকার হরণ করা ছিল তখন নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার, শক্তিশালীরা দুর্বলদেরকে গ্রাস করত, মানুষ

মানুষের উপর জবরদখল চালাতো...। এ জন্যই পারস্যের সেনাপ্রধান যখন রিবয়ী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে **প্রশ্ন** করল: তোমরা কেন এসেছো?

তিনি বললেন: আল্লাহ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর কসম, আমরা এ জন্যই এসেছি যে, আল্লাহ যাকে চান তাকে যেন আমরা মানুষের দাসত্ব থেকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে, পার্থিব সংকীর্ণতা থেকে বিশালতার দিকে, বিভিন্ন ধর্মের অত্যাচার থেকে ইসলামে ইনসাফের দিকে বের করে আনতে পারি।[২]

ইসলামে জাতভেদ নেই; শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি 'তাকওয়া'

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব ঘটল। তার নিকট ওহীর মারফত ইসলামী শরী'আত আসল। তাকে নির্দেশ দেয়া হল হকের দাওয়াত উচ্চকিত করার। হুকুম দেয়া হল, সর্ব প্রথম নিজ পরিবার ও প্রিয়জনদেরকে, তারপর বিশ্ববাসীকে সতর্ক করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাতকে সমগ্র জগতের জন্য রহমত হিসেবে নির্ধারণ করে ঘোষণা করলেন,

﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ﴾

"আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।" সূরা আম্বিয়া ২১:১০৭

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমাজে আগমন করেছিলেন, সেখানে শ্রেণী সংঘাত চরম আকারে বিদ্যমান ছিল। এ গোত্র ওই গোত্র থেকে শ্রেষ্ঠ, এরা ওদের চেয়ে উঁচুস্তরের, ওদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অন্যদের উপর বেশি ইত্যাদি বিভিন্ন গোষ্ঠিগত স্তরভেদ ও শ্রেণী সংঘাতের মাধ্যমে মানুষে মানুষে উঁচু-নিচু স্তর সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল। এই পরিস্থিতে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মহান বার্তা নিয়ে আগমন করলেন। আর তা হল,

---

[২] তারিখে তবারী ৩/৫২০, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৭/৪৬

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ﴾

হে মানব,আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু। সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩

উক্ত ঘোষণার মাধ্যমে লিঙ্গ, বর্ণ, বংশ, গোত্র, দেশ, অঞ্চল ইত্যাদিকে শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ না করে সে ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসানো হয়েছে যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু।

এ মর্মে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

হে মানুষেরা, তোমাদের স্রষ্টা এক, তোমাদের পিতা এক। তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি ছাড়া কোন অনারবের উপর আরবীর কিংবা আরবীর উপর অনারেবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই অথবা কৃষ্ণাঙ্গের উপর শেতাঙ্গের কিংবা শেতাঙ্গের উপর কৃষ্ণাঙ্গের শ্রেষ্টত্ব নেই।[৩]

তিনি আরও বলেছেন, “সব মানুষ সমান চিরুনীর দাঁতের মত। তবে ইবাদতের দিক দিয়ে একে অন্যের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে।”[৪] এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ কথা হল, এ হাদীছটি প্রযোজ্য আল্লাহর হুকুম-আহকাম প্রয়োগ

[৩] মুসনাদে আহম ৩৪/৪৭৪, বায়হাকী, শুয়াবুল ঈমান ৭/১২৩, হিলয়া, আবু নাঈম ৩/১০০)

[৪] মুসনাদ কুযায়ী ১/১৪৫, কিতাবুল আমসাল ফিল হাদীছ, আল আসবাহানী পৃষ্ঠা নং ২০৩ (এটি আরও বর্ণনা করেছেন ইবনে আদী তার যুয়াফা কিতাবে এবং এটিকে মাউযু (বানোয়াট) হাদীছ হিসেবে হুকুম দিয়েছেন। ইবনুল জাওযী এই হাদীছটিকে তার আল মাউযূআত (বানোয়াট হাদীছ) কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আলবানী (রহিমাহুল্লাহ) এটিকে অত্যন্ত দুর্বল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।-অনুবাদক)

হওয়ার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ শরী'আতের হুকুম দেয়ার ক্ষত্রে আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে সম ভাবে সম্বোধন করেছেন। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ, স্বাধীন-দাস, ধনী-গরীব এর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব গ্রহণ করতে সকল মানুষকে সমভাবে আহবান জানানো হয়েছে। সব মানুষই আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিত। সব মানুষকেই যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করতে হবে...। সুতরাং শরী'আতের নির্দেশের ক্ষেত্রে সকল মানুষের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ সমতা রয়েছে।

সংকীর্ণ জাতীয়তাবদ নয় বরং উদার ভ্রাতৃত্ব:

উজ্জলতম কয়েকটি উদাহরণ:

ইসলাম আসার পরে মানুষে মানুষে ব্যবধান ভেঙ্গে দিয়ে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের নির্দেশ দেয়। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দাস এবং স্বাধীন ব্যক্তির মাঝে ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি পারস্য দেশে থেকে আসা সালমান ফারেসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে আহলে বায়ত বা নাবী পরিবারের সদস্য হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন,

سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ

"সালমান আমাদের পরিবারের সদস্য।[৫] (এ হাদীছটি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত মারফু সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তা সঠিক নয়। বরং সঠিক কথা হল, এটি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত মাওফুফ সূত্রে বর্ণিত।)

এই সমতা এবং ভেদাভেদ হীনতা এই জন্যই যে, ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবে অধিকার প্রদানের প্রতিযোগিতায় বহু অগ্রগামী। আল্লাহর সামনে অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। অনুরূপভাবে মানুষও পরস্পরের প্রতি অধিকার দেয়া ও নেয়ার ক্ষেত্রে সমান।

[৫] তবারানী ফিল কাবীর, ৬/২১২, হাকিম ৩/৬৯১, মুসান্নাফ ইবনে শায়বা ১২/১৪৮, ইবনে সাদ ৬/৩৪৬, ৪/৮৫, আবু নাঈম ফিল হিলয়াহ।

নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ বিন হারিসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে এক বিরাট সংখ্যক মুসলিম সেনা বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেছেন যদিও তিনি ছিলেন একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস। তারপরে তার ছেলে উসামা বিন যায়েদকে তিনি সেনাপ্রধান বানিয়েছেন। তারপরে আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলীফা হওয়া পর মুসলিম সেনা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তাকেই বহাল রেখেছেন।

মুসলিমগণ বিভিন্ন দেশ বিজয় করার পর যখন ইসলাম চর্তুদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন অনারবদের মধ্যে থেকে বড় বড় আলেম, মসজিদের ইমাম এবং জ্ঞানের জগতে এমন বড় বড় ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হল যাদের নিকট মানুষ জ্ঞানের অমীয় সুধা আহরণ করত।

বরং ইতিহাস বলে, অনেক অনারব মুসলিম ইলম, ফতোয়া ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। নেতৃত্ব দিয়েছে আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে। যেমন, ইলমী জগতের এক দিকপাল আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি আরবীয় ছিলেন না। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তিনিও ছিলেন অনারব। তাঁর রচিত ছুহীহ বুখারী কত বড় অনুসরণীয় গ্রন্থ!! এমন কোন মুসলিম নেই যিনি ইমাম বুখারীকে চিনে না। ইমাম আবু হানীফা (রহিমাহুল্লাহ) এবং ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) ছাড়াও অনেক বড় বড় ইমাম অনারব থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সুতরাং মানুষই যখনই ইসলামকে বাস্তবায়ন করেছেন ইসলাম মানুষের মধ্য থেকে ভেদাভেদ তুলে দিয়েছে। যার ফলে অনারবরা আরবদের ইমাম এবং নেতায় পরিণত হয়েছে। এভাবে অনারবদের অগ্রগামী হওয়ার কারণ কি? কারণ হল, তারা দীনের দায়িত্ব বহন করেছেন, তাওহীদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র ঝাণ্ডা উত্তোলন করেছেন। ইসলাম মুসলিমদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, তাকওয়া ছাড়া আরব-অনারবের মাঝে কোন ব্যবধান নেই।

মুসলিমগণ যতদিন ইসলামের শিষ্টাচার মেনে চলেছেন তত দিন তাদের মাঝে কোন শ্রেণী বৈষম্য বা ভেদাভেদ ছিল না।

সুতরাং ইসলামই সর্ব প্রথম শ্রেণী বৈষম্য রহিত করে সমতা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং বিশ্ববাসীকে তা বাস্তবায়নের পথ দেখিয়েছে। ইসলামের ইতিহাস এসব ঘটনায় সমৃদ্ধ। সুতরাং সাম্যের এ মহান মূলনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামই অগ্রদূত। ইতিহাস তারই স্বাক্ষ্য দেয়।

মোটকথা, ইসলামী শরী‘আতই সাম্যের অধিকার যর্থাথ ও পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

ইসলামে সাম্য

সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শরী‘আতে দুটি বিষয় রয়েছে। যথা:

ক. সমতা

খ: ইনসাফ

সর্বক্ষেত্রে ইনাসাফ করা অপরিহার্য কিন্তু সমতা বাস্তবায়ন করতে হবে যথাস্থানে। সমতা সব ক্ষেত্রে এক নয়। আরও স্পষ্ট করে বললে, ইনসাফ বলা হয়, প্রত্যেককে তার যথাযথ প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া এবং কারও অধিকার লঙ্ঘণ না করা। এটাই হল, ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা। আল্লাহ তা‘আলা সর্বক্ষেত্রে এই ন্যায়পরায়ণতা বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ﴾

“আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা,সদাচরণ এবং আত্নীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন।” সূরা নহল ১৬:৯০

সুতরাং ইনসাফ মানে হল, প্রত্যেক মানুষকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেয়া। এর নামই ন্যায়-পরায়ণতা। এই কারণ ঐ কারণ দেখিয়ে কাউকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। বরং যেখানে যাকে যা দেয়া প্রয়োজন সেখানে তাকে তাই দিতে হবে।

এই কারণে ইসলাম হদ বা শরী‘আত নির্ধারিত দণ্ড প্রয়োগ হয় এমন অপরাধ ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে সকল অপরাধীকে সমান ভাবে বিচার করতে বলেনি। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ

“কোন (সৎ ব্যক্তি) যদি হঠাৎ করে বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়ে কোন অপরাধে করে ফেলে তবে তাকে ছেড়ে দাও। তবে যদি এমন অপরাধ করে যাতে শরী‘আত নির্ধারিত দণ্ড প্রযোজ্য হয় তা হলে ভিন্ন কথা।”[৬]

এ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পেশাদার অপরাধী এবং বিভিন্ন অন্যায়ের সাথে জড়িত আর একজন ভাল মানুষ কিন্তু পরিস্থিতির শিকার হয়ে হঠাৎ কোন অন্যায় করে ফলেছে উভয়কে সমানভাবে বিচার না করাটাই ইনসাফ। কারণ, এ ক্ষেত্রে উভয়কে এক সমান মনে না করার মধ্যেই শরয়ী দৃষ্টিতে বিরাট কল্যাণ নিহীত রয়েছে।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সরকারী অনুদানের ক্ষেত্রে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীদেরকে অন্যদের সমান অনুদান দিতেন না। (বরং তাদেরকে আলাদভাবে মূল্যায়ণ করতেন।) অনুরূপভাবে যারা আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন আর আর যারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে বাইতুল মাল থেকে অনুদানের ক্ষেত্রে একইভাবে মূল্যায়ণ করতেন না। বরং যে যতটুকু হকদার তাকে ততটুকু দান করতেন। ইসলামে যার অগ্রগণ্যতা রয়েছে তাকে তিনি দানের ক্ষেত্রেও অগ্রগণ্য করতেন। এটাই ইনসাফ। কেননা, মানুষদের মধ্যে ইসলামকে সাহায্য করা, যোগ্যতা ও সামর্থগত পার্থক্য থাকার পরেও সবাইকে এক দৃষ্টিতে দেখা শরী‘আত সম্মাত নয় বরং শরী‘আতের নির্দেশ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা।

ইসলামী শরী‘আতে মানুষের অধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে, নেয়ার ক্ষেত্রে, বিচারাচারে জুডিশিয়াল রাইট (Judicial rights) ইত্যাদির ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং রাষ্ট্র, রাষ্ট্রপ্রধান, বিচারক এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য অপরিহার্য হল, তারা সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে বিচার করবে। কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দিবে না। এমন কি বিচারের এজলাসে যদি একজন মুসলিম ও একজন কাফির এসে হাজির হয় তাহলে বিচারক বিচারের ক্ষেত্রে মুসলিম ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য করবে না। কারণ আদলত হল ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার স্থান। এ ক্ষেত্রে সব মানুষই সমান।

---

[৬] ছ্বহীহ: আবুদাউদ হা/৪৩৭৫, মুসনাদ আহমদ হা ৪২/৩০০, নাসাঈ ফিল কুবরা হা/৭২৫৩ ইত্যাদি।

প্রতিটি মানুষের এটি একটি সাধারণ অধিকার যে, ইসলামী শাষণ ব্যবস্থায় মানুষ আদালতের ক্ষমতা বলে তার প্রাপ্য বুঝে পাবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ﴾

“অতএব, তারা যদি আপনার কাছে আসে, তবে হয় তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিন, না হয় তাদের ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকুন। যদি তাদের থেকে নির্লিপ্ত থাকেন, তবে তাদের সাধ্য নেই যে, আপনার বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারে। যদি ফয়সালা করেন, তবে ন্যায় ভাবে ফয়সালা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালবাসেন।” সূরা মায়িদাহ ৫:৪২। এ মর্মে আরও আয়াত রয়েছে।

সাম্য ও ইনসাফের উজ্জল দৃষ্টান্ত

ক. প্রতিটি মানুষই তার অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে সমান। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অধিকারের কথা ঘোষণা করেছেন। যেমন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের ধ্বংসের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, তাদের ধ্বংসে অন্যতম কারণ ছিল, তারা আল্লাহর বিধিবিধান ও শরী‘আতের দণ্ডবিধি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত এবং নিম্নশ্রেণীর মাঝে পার্থক্য করেছিল। তাই এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

“আল্লাহর কসম, মুহাম্মদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত তবে তার হাত কেটে ফেলতাম।”[৭]

[৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৭৫ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/ ১৬৮৮

খ. মুসলিমদের রক্ত, সম্পদ এবং মর্যাদা সমান। শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্মান-মর্যাদা, রক্ত, অর্থ-সম্পদ ইত্যাদিতে কোন ভেদাভেদ নেই। বিচারের ক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে পার্থক্য নেই। বরং আল্লাহর আইনের সামনে সকলেই সমান। যার কারণে দেখা যায়, বদর যুদ্ধে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এক ব্যক্তি কষ্ট পেয়েছেন বলে দাবি করার কারণে তিনি তার নিকট নিজেকে সপে দিয়েছেন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।

যেমন উসাইদ বিন হুযাইর (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি (উসাইদ) লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন। তিনি কৌতুকের ছলে কথার মাধ্যমে লোকজনকে হাসাচ্ছিলেন। এমন সময় নাবী হঠাৎ তাঁর কোমরে একটি লাঠি দিয়ে গুতো দেন। উসাইদ (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আমি প্রতিশোধ নিতে চাই। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: ঠিক আছে, প্রতিশোধ গ্রহণ করো। তিনি বললেন: আপনার গায়ে জামা আছে। কিন্তু আমার গায়ে তখন কোন জামা ছিলো না। অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের গায়ের জামা তুলে ধরলেন।তখন তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে তার কোমরের পেছন দিক থেকে একপার্শে চুমু খেতে শুরু করলেন।

তারপর বললেন: হে আল্লাহর রসূল, এটাই আমি চাচ্ছিলাম।[৮]

গ. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের উপর দয়াপরবশ হয়ে বলেছেন,

اللهُمَّ فَأَيُّمَا عَبْدٍ مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"হে আল্লাহ, আমি যদি কোন ঈমানদারকে গালি দিয়ে থাকি তবে সেটিকে তুমি কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির জন্য নৈকট্য অর্জনের মাধ্যমে বানিয়ে নিয়ো।"[৯]

---

[৮] আবু দাউদ ৫২২৪, ত্ববারানী ফিল কাবীর ১/২০৫, ২০৬, হাকিম ৩/৩২৭, বায়হাকী ফিল কুবরা ৮/৭৮

[৯] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৩৬১ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬০০

সাম্য ও ইনসাফের ব্যাপারে ইসলামের বলিষ্ঠ উচ্চারণ

১. জুডিশিয়াল রাইটস (Judicial Rights) বা বিচারিক অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। সে মুসলিম হোক বা অমুসলিম হোক। ইসলামী শরী‘আতে এ ক্ষেত্রে মানুষের মাঝে কোন ভেদাভেদ নেই। আমরা কোন খৃষ্টানের অধিকার কোন মুসলিমকে দিবো না আর কোন ইহুদির অধিকার কোন মুসলিমকে দিবো না। বরং স্বাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে যার অধিকার প্রমাণিত হবে সেই তা পাবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“তোমার নিকট যে ব্যক্তি আমানত দিলো তুমি তার আমানত তাকে ফিরিয়ে দাও। আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল তুমি তার সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করো না।”[১০]

২) আল্লাহর বিধান সবার জন্য সমান। তাই সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার কার্য পরিচালনার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ﴾

“আপনি আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করুন।” সূরা মায়িদাহ ৫:৪৯

৩) আল্লাহ আমাদেরকে ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যের স্বাক্ষী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন যদি তা আমাদের বিপক্ষেও যায়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ﴾

---

[১০] ছ্বহীহ: আবুদাউদ হা/৩৫৩৪, তিরমিযী হা/১২৬৪, আহমদ হা/২৪/১৫০ বায়হাকী ফিস সুনান ১০/৪৫৬ ইত্যাদি

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক; আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্যদান কর, যদিও তা তোমাদের নিজের বিপক্ষে যায়।” সূরা নিসা ৪:১৩৫

৪) কোন অবস্থায় ন্যায়-ইনসাফ থেকে সরে আসা যাবে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ﴾

“হে মুমিনগণ,তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে ন্যায় সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে কখনও ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার কর। এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী।” সূরা মায়িদাহ ৫:৮

তাই তো দেখা যায়, সাহাবীদের যুগে কোন ইহুদী কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে বিচারের মসজলিসে হাজির হলে ইহুদী আর মুসলিম বলে কোন পার্থক্য করা হতো না। বরং শরী‘আতের হুকুম এবং বিচারের ক্ষেত্রে উভয়কে বিচারের কাঠগড়ায় সমান ধরা হতো। কারো প্রতি অবিচর করা হতো না। কিন্তু কেন? উত্তর হল, এ সকল বিষয়ে পার্থক্য করা হলে, পৃথিবীতে বিশংখলা সৃষ্টি হবে। অথচ আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًاۚ﴾

“পৃথিবীকে সংস্কার করার পর তাতে আবার বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। তাঁকে আহবান কর ভয় ও আশা সহকারে।” সূরা আরাফ ৭:৫৬

এ পৃথিবীকে সংস্কার করা সম্ভব হবে কেবল জ্ঞানের মাধ্যমে এবং নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাতে বিশ্বাস করত তার আনীত শরী‘আত অনুমোদিত বিভিন্ন অধিকার আদায়ের মাধ্যমে। আর শরী‘আত নির্দেশিত সবচেয়ে বড় অধিকার হল, আল্লাহর তাওহীদ বাস্তবায়ন করা এবং

শিরক পরিত্যাগ করা। আর সবচেয়ে বড় বিশৃংখলা হল, আল্লাহর অধিকার নষ্ট করা তারপর মানুষের অধিকার নষ্ট করা।[১১]

এভাবে যখন ক্রমান্বয়ে পৃথিবীতে বিপর্যয়-বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ে তখন মহান আল্লাহর ক্রোধ অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى ۖ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ﴿٨٢﴾﴾

"বলেছি আমার দেয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং এতে সীমালংঘন করো না,তাহলে তোমাদের উপর আমার ক্রোধ নেমে আসবে এবং যার উপর আমার ক্রোধ নেমে আসে সে ধ্বংস হয়ে যায়। আর যে তওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে অতঃপর সৎপথে অটল থাকে তার প্রতি আমি পরম ক্ষমাশীল।" সূরা ত্বহা/৮১-৮২

শরী'আতের দৃষ্টিতে অমুসলিমদের প্রকারভেদ

শরী'আতের দৃষ্টিতে ইসলামী দেশে বরং পৃথিবীতে মানুষ পাঁচ প্রকার। যথা:

প্রথম: মুসলিম

দ্বিতীয়: জিম্মি অর্থাৎ মুসলিমদের দেশে মুসলিম সরকারের জিম্মায় (নিরাপত্তায়) থাকা ইহুদী-খৃষ্টান বা আহলে কিতাবগণ। (ফকীহদের কিতাবে জিম্মির বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে।)

তৃতীয়: মুয়াহিদ তথা মুসলিম সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম।

চতুর্থ: মুস্তামিন তথা ইসলামী সরকারের নিরাপত্তা নিয়ে নিজ দেশ থেকে আগমনকারী অমুসলিম।

[১১] তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম ১/১৫০১, ৫/১৫২০ ইমাম সূয়ুতী এ বক্তব্যটিকে আদ দুররুল মানসূর (৩/৪৭৬, ৪৭৭) গ্রন্থে তাফসীরে আবীশ শায়খ থেকে সংকলন করেছেন।

পঞ্চম: হারবী তথা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধরত অমুসলিম। এভাবেও বলা যায় যে, পৃথিবীতে অমুসলিম হল চার প্রকার। যথা: জিম্মি, মুয়াহিদ, মুস্তামিন ও হারবী।

ইসলামে অমুসলিমদের অধিকার

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল কাফিরদের প্রত্যেককে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। বরং আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অমুসলিমদেরকে তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন যদি তারা হারবী না হয় অর্থাৎ যদি তারা ইসলামের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ না করে বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

﴿لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ إِنَّمَا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَٰتَلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَأَخۡرَجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ وَظَٰهَرُواْ عَلَىٰٓ إِخۡرَاجِكُمۡ أَن تَوَلَّوۡهُمۡۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ﴾

"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি,তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ কারীদেরকে ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিস্কার কার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম।" সূরা মুমতাহিনা ৬০:৮-৯

সুতরাং ইসলামী শরী'আতে জিম্মি কাফিরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সে কাফির বলে তার মানবাধিকার হজম করে ফেলার কোন সুযোগ নেই। বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তা নির্ধারিত করেছেন। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَجِدْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامً

“যে ব্যক্তি কোন জিম্মি (মুসলিমদের জিম্মা বা নিরাপত্তায় থাকা) ইহুদী-খৃষ্টান বা আহলে কিতাবগণকে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।”[১২] রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন,

مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا

“যে ব্যক্তি মুয়াহিদ তথা চুক্তিবদ্ধভাবে মুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিমকে হত্যা করল সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না। অথচ চল্লিশ বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাওয়া যায়।”[১৩]

যে কোন জিম্মি কাফেরকে নিরাপত্তা দেয়ার ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মুসলমানকেও সচেষ্ট থাকতে হবে। কারণ, সে ইসলামী সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ এবং আইনগতভাবে নিরাপত্তা প্রাপ্ত। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে তার জান-মাল, সম্ভ্রম-মর্যাদার প্রতি কোনরূপ অবিচার করা যাবে না। কারণ, ইসলামী শরী‘আতে তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। কুরআন ও হাদীসে জিম্মি, মুয়াহিদ এবং মুস্তামিন এর অধিকার সংক্রান্ত অনেক সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান রয়েছে। মুসলিম পণ্ডিতগণও এ মর্মে বহু বক্তব্য পেশ করেছেন।

- **হারবী** তথা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ লিপ্ত অমুসলিমদের ব্যাপারে বহু বিধিবিধান রয়েছে। যেমন, যদি যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে কোন যুদ্ধরত কাফিরকে মুসলিমগণ পাকড়াও করে নিয়ে আসে তবে তাকে সম্মান করতে হবে। অনুরূপভাবে গ্রেফতারকৃতদের মাঝে যদি নবজাতক, শিশু, মহিলা বা বৃদ্ধ মানুষ থাকে তবে তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। এমন উদাহরণ আরও রয়েছে।

---

[১২] মুসনাদ আহমদ ১১/২৫৬, ইবনে মাজাহ হা/২৬৮৬, নাসাঈ ফিল মুজতাবা ৮/২৫, নাসাঈ ফিল কুবরা ৮৭৪২, হাকিম ২/১২৬, বায়হাকী ফিস সুনান ৯/২০৫, ইবনে আবী শায়বা ৯/৪২৬

[১৩] ছহীহ বুখারী হা/৩১৬৬

পক্ষান্তরে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মমতে এদের সকলকে হত্যা করার আইন আছে। যেমন, মূসা (আলাইহিস সালাম) এর শরী'আতে যুদ্ধাবস্থায় যাদেরকেই পাকড়াও করা হবে তাদের সকলে হত্যা করতে হবে। কিন্তু ইসলামী শরী'আত যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এবং এদেরকে হত্যা না করার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত রয়েছে। তাই ইসলামী শরী'আতের আইন হল, শুধু সে অমসুলিমকেই হত্যা করা হবে যে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে। কিন্তু সে মুসলিম বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হলে তার জন্য রয়েছে অনেক বিধিবিধান।

ইসলামী দেশে একজন অমুসলিমের বিভিন্ন অধিকার রয়েছে। যেমন, সে ঘরের মধ্য যা ইচ্ছা করুক কিন্তু প্রকাশ্যে-জনসম্মুখে যা মনে চায় তাই করতে পারবে না। বাইরে জনসম্মুখে কোন ইসলামের হারাম বা নিষিদ্ধ কোন কাজ করতে পারবে না।

অনুরূপভাবে প্রকাশ্যে সে তার ধর্মীয় কার্যক্রম করতে পারবে না। এ সব বিধান মুয়াহিদ (চুক্তিবদ্ধভবে মুসলিম দেশে বসবাসকারী অমুসলিম), মুস্তামিন (ইসলামী সরকারের নিরাপত্তা নিয়ে নিজ দেশ থেকে আগমনকারী অমুসলিম) এর জন্যও প্রযোজ্য।

কিন্তু জিম্মির ব্যাপারে আইন আরও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। যেমন যদি তারা মুসলিমদের বিজিত অঞ্চলের অধিবাসী হয়। আর সে দেশে তাদের গির্জা থাকে (যেমন, শাম, ইরাক ও মিসরের গির্জা সমূহ) তাহলে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আইন রয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলিম দেশে তারা জনসম্মুখে তাদের ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তারা মুসলিম দেশে প্রকাশ্যে ক্রুশ ঝুলাতে পারবে না বা মন চাইলেই যেখানে খুশি মদপান, জিনা-ব্যাভিচার ইত্যাদি করতে পারবে না।

কেউ যদি তার ঘরের মধ্যে মদ পান করতে চায় তাহলে গোপনীয়তা রক্ষা করে সেটা তার করার অধিকার রয়েছে। তার বাড়িতে সে যা ইচ্ছা করতে পারে। এটা তার অধিকার এবং ইসলামী শরী'আত তার এ অধিকার সংরক্ষণ করবে। কিন্তু ইসলামী দেশে প্রকাশ্যে ইসলামী শরী'আত বিরোধী কিছু করতে পারবে না। সে যদি গোপনে কিছু করে তবে আমরা সেটা তল্লাশী করতে যাবো না।

অনুরূপভাবে তারা তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার অধিকার রাখে। যেমন, কতিপয় ব্যবসায়ী উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট মদীনায় থাকার অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে সেখানে থাকার সুযোগ দিলেন। তবে তিনি তাদেরকে তিন দিনের অতিরিক্ত থাকার অনুমতি দিলেন না। কারণ, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদী-খৃষ্টানদেরকে আরব উপদ্বীপে রাখতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। তবে মক্কা-মদীনা ছাড়া অন্যত্র তারা তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত করে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে। ইসলাম তাদেরকে এই অর্থনৈতিক অধিকার প্রদান করেছে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রতিভাত হয়েছে যে, ইসলাম বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষকে অর্থনৈতিক অধিকার, সমতা এবং ইনসাফপূর্ণ বিধান দিয়েছে। এগুলোর অনন্য দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদার যুগে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে।

ইসলামে মানুষের স্বাধীনতা

মানবাধিকার কথাটি সম্পৃক্ত স্বাধীনতার সাথে। আর স্বাধীনতার ব্যাপারে কথা হল, যেমনটি আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, বাধামুক্ত শর্তহীন স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। বরং যে স্বাধীনতার কথা বলা হচ্ছে তা শর্তযুক্ত স্বাধীনতা।

গবেষণা করলে দেখা যায় যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন,

-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা

-সফর ও চলাচলের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা

-যে কোন শহরে বসবাস ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা ইত্যাদি।

-রাজনৈতিক স্বাধীনতা (তাদের ভাষায়)

- যে কোন মানুষের যে কোন ধর্ম গ্রহণের স্বাধীনতা ইত্যাদি।

জাতিসংঘ প্রণিত ‘মানবাধিকার সনদ’ এ সকল বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কিন্তু ইসলামী শরী‘আতে মানুষকে পূর্ণ ও বাধাহীন স্বাধীনতা দেয়া হয়নি- যেমনটি আগে আলোচনা করা হয়েছে। কেননা, মানুষকে যদি শর্তহীনভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় আর এ সুযোগে যেখানে যা খুশি করবে বেড়াবে তাহলে তা বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণকর হবে না। আর ব্যক্তি বিশেষের কল্যাণের চেয়ে সমাজ, দেশ ও জাতির কল্যাণ অগ্রগণ্য। এ মর্মে সকল ধর্ম ও মতাদর্শ একমত।

এই কারণে ইসলামী শরী‘আত বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের বড় বড় বিষয়ে স্বাধীনতার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। তবে সে স্বাধীনতা এমনভাবে প্রয়োগ করে যাতে মানুষ ইসলাম প্রদত্ত কল্যাণ লাভ করতে পারে। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইসলাম এসেছে মানবজাতির কল্যাণ সাধন করার জন্য এবং তাতে পূর্ণতা দেয়ার জন্য। অনুরূপভাবে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছে মানবজাতিকে অকল্যাণ ও বিপর্যয়ের হাত থেকে থেকে রক্ষা করার জন্য বা সমাজ থেকে অকল্যাণের প্রাদূর্ভাব কমানোর জন্য।

ইসলাম স্বীকৃত পাঁচটি মৌলিক অধিকার

ইসলাম মানুষের পাঁচটি অপরিহার্য মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে। এগুলো ব্যতিরেকে মানুষের জীবন ধারণ করা সম্ভব নয়। যেমন,

এক. দীন রক্ষা

দুই. জীবন রক্ষা

তিন. সম্পদ রক্ষা

চার. বিবেক রক্ষা

পাঁচ. বংশ বা সম্ভ্রম রক্ষা

ইসলামী শরী‘আত মানব জাতির এই পাঁচটি বিষয় সংরক্ষণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এগুলো ছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ স্বাধীন।

কতিপয় স্বাধীনতা ও পর্যালোচনা

১) অর্থনৈতিক স্বাধীনতা:

ইসলামী শরী'আত সমগ্র মানব জাতির জন্য যে সকল স্বাধীনতার বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেছে সেগুলোর মধ্যে একটি হল, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। তবে শর্ত দিয়েছে যে, এই সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে তা এমন কাজে ব্যবহার করবে যাতে তার নিজের উপকার হয়। আর এমন কাজে সে সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না যে কারণে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কেউ যদি তার সম্পদ নষ্ট করে তবে ইসলাম তার জন্য সম্পদ ব্যায়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে। ইসলামী ফিকহ্ শাস্ত্রে بَابُ الْحَجرِ বা "সম্পদ ব্যয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ”" প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ একটি অধ্যায় রয়েছে। কোন মানুষ যদি নিজস্ব প্রয়োজনে বা তার সন্তান-সন্ততির প্রয়োজনে অর্থ-সম্পদ ব্যয় না করে বরং খেয়াল-খুশি অনুযায়ী সম্পদ খরচ করে অথচ তার পরিবার অর্থাভাবে দিনাতিপাত করে-এ পরিস্থিতিতে তার সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনগণ ইসলামী সরকারের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে সরকার সে ব্যক্তির সম্পদ ব্যয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করবে।

অনুরূপভাবে, কোন এতিম শিশু যদি উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদের মালিক হয় তাহলে এ কথা বলা যাবে না যে, সে যেহেতু অনেক সম্পদের মালিক সুতরাং এই আট/দশ বছরের শিশু তার ইচ্ছামত গাড়ি কিনবে, যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াবে আর মন মত অর্থ ব্যয় করবে!! না, তা হবে না। বরং কথা হল, ইসলামী শরী'আত এই এতিম শিশুর জন্য অভিভাবক নির্ধারণ করেছে। অভিভাবক শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ খরচ করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

﴿فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ﴾

“যদি তাদের (এতিম শিশু) মধ্যে বিচার-বুদ্ধি আঁচ করতে পার, তবে তাদের সম্পদ তাদের হাতে অর্পন করতে পার।” সূরা আন নিসা ৪:৬

ইসলাম মানুষকে অর্থনৈতিক ভাবে অনেক স্বাধীনতা দিয়েছে। সে বৈধভাবে যে কোন অর্থ-সম্পদের মালিক হতে পারে। সে বৈধভাবে তার সম্পদ যেভাবে খুশি সেভাবে ব্যবহার করতে পারে। ঋণ দিবে, ঋণ নিবে, উপার্জন

করবে, সম্পদ নিয়ে যেখানে খুশি সেখানে যাবে যদি তা শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে হয় বা যদি সেটা তার নিজস্ব প্রয়োজন বা তার পরিবার পরিজনের দরকারে খরচ করে। কিন্তু যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তবে তার সে অধিকার খর্ব করা হবে।

সম্পদ তার মালিকানায় থাকার পরও কেন ব্যায়ের ক্ষেত্রে তার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়া হল? উত্তর হল, যদি তাকে যেভাবে খুশি সেভাবে সম্পদ ব্যবহারের অধিকার দেয়া হয় তবে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। মানুষ যখন নিজের ক্ষতি করতে চাইবে তখন অন্যান্য সকল মুসলিমের উপর আবশ্য হবে তার কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখা। কেননা, ইসলামী শরী'আতে মুসলিমগণ একে অপরের ভাই। একে অপরের কল্যাণ কামনা করবে এবং একে অপরকে সাহায্য করবে।[১৪]

সুতরাং কোন মানুষের জন্য দুনিয়া কিংবা আখিরাতে ক্ষতি সাধন করবে এমন কোন ক্ষেত্রে সম্পদ নষ্ট করার কোন সুযোগ নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ইসলামে সম্পদ খরচের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা না থাকার দিকটি খুব কম বরং স্বাধীনতার দিকটিই বেশি। মানুষ যেভাবে খুশি সম্পদ খরচ করতে পারে যদি তা শরী'আত অনুমদিত ক্ষেত্রে হয়।

২) রাজনৈতিক অধিকার:

স্বাধীনতার আরেকটি উদাহরণ রাজনৈতিক অধিকার। রাজনৈতিক অধিকার বলে পাশ্চাত্যে যে শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হল, গণতান্ত্রিক নির্বাচন। গণতান্ত্রিক নির্বাচন কখনো হয় ন্যায় সঙ্গত আবার কখনো হয় প্রভাবিত। কারণ নির্বাচন কে করে? মানুষ।

---

[১৪] যেমন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে শুয়াইব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলিমদের সকলের রক্ত (কিসাস বা রক্তপণ ইত্যাদিতে) সমান। আর মুসলিমদের একজন সর্বনিম্ন শ্রেণীর (দাস)ও যদি কোন কাফিরকে নিরাপত্তা দেয় তবে অন্য সকল মুসলিমগণ তা পালন করবে। দূরের কোন মুসলিম যদি কোন কাফিরকে আশ্রয় দেয় তবে (সেই কাফিরের বাড়ির পাশের ব্যক্তিও) তা পালন করবেন। মুসলিমগণ (সহযোগিতার ক্ষেত্রে) পরস্পরের জন্য হবে তাদের (শত্রুদের বিরুদ্ধে) একটি হাতের মত। (সুনান আবু দাউদ/২৭৫১)

আপনারা জানেন যে, বর্তমানে যে সব উন্নত দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেগুলোতে নির্বাচনের জন্য প্রচার-প্রচারণা চালানো হয়ে থাকে। যার অর্থ-সম্পদ বেশি তার পক্ষে প্রচারণাও হয় বেশি। যার ফলে সে তার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। অবশেষে নির্বাচনে সেই হয় বিজয়ী। যদিও সে দেশ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু মানুষ তাকে সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করে নির্বাচিত করে। এভাবে সে সকলকে প্রতারিত করতে সক্ষম হয়। কারণ, নির্বাচিত ব্যক্তিগণ প্রকৃতপক্ষে সৎ ও কল্যাণ কর কি না তা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। সব মানুষের বিচার-বুদ্ধি তো এক সমান নয়। এমনও হতে পারে, অধিকাংশ মানুষই সচেতন বিচার-বুদ্ধির অধিকারী নয়। তাই অধিকাংশ মানুষই জানে না দেশ, জাতি এবং সর্ব সাধারণের জন্য কে বেশি কল্যাণকর? এ সব নানা কারণে নির্বাচন প্রভাবিত হয়।

নির্বাচনে অর্থের মাধ্যমে যারা প্রভাব সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে আরও যারা রয়েছে তারা হল, বিশাল অর্থ-সম্পদের অধিকারী ইহুদী ও খৃষ্টান বলয়। এদের মাধ্যমেও নির্বাচন প্রভাবিত হয়। তারা এভাবে অর্থ খরচ করে এ জন্য যে, যাতে নির্বাচনে এমন ব্যক্তি বিজয়ী হয় যে তাদেরকে সমর্থন করবে।

মোটকথা, যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ হল, একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া এবং পার্লামেন্টে যাওয়া আর সেটা সব সময় দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর নাও হতে পারে।

ইসলামে শাসক নির্বাচন পদ্ধতি

ইসলামী শরী‘আতে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়টি আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ[১৫] তথা মুসলিম উম্মার আলেম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপর শাসক নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। দেশের অভিভাবক, ইমাম, রাষ্ট্রপ্রধান ও দেশ পরিচালনার জন্য যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচনের দায়িত্ব ইসলাম সর্ব সাধারণের উপর অর্পন করেনি। রাষ্ট্রের অভিভাবক নির্ধারণে ইসলাম অজ্ঞ আর জ্ঞানী, দীন সম্পর্কে মূর্খ আর আলেমকে সমানভাবে মূল্যায়ন করেনি। শরী‘আত বলেনি যে, উভয়ের ভোট সমান। এক্ষেত্রে যদি সবাইকে সমানভাবে দেখা হয় তবে সেটাই হবে অন্যায়।

বরং ইসলাম এই দায়িত্ব দিয়েছে আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ তথা মুসলিম উম্মার আলেম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের উপর। যেমন, আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নাম ঘোষণা করেছেন। উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য আহলে শুরা তথা বিচক্ষণ ও যোগ্য একদল সাহাবীর সমন্বয়ে গঠিত উপদেষ্টা পরিষদের উপর দায়িত্ব অর্পন করে গেছেন। এটি একটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়।

---

[১৫] আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ বলতে মুসলিম উম্মার সেই সব আলেম, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রথম সারির ব্যক্তিগণ উদ্দেশ্য যাদের মধ্যে তিনটি শর্ত বা গুণাবলী বিদ্যমান। যথা:

(১) পরিপূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা ও সততা।

(২) এমন জ্ঞান এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, যার মাধ্যমে শাসক হওয়ার জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে সনাক্ত ও নির্বাচন করা সম্ভব।

(৩) এমন হিকমত ও প্রজ্ঞা, যার মাধ্যমে শাসন ক্ষমতার জন্য যোগ্য একাধিক ব্যক্তি থেকে সর্বাধিক যোগ্য এবং জনসাধারণের কার্যাদি পরিচালনায় সর্বাধিক উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যায়। আর এককথায়, মুসলিম উম্মার আলেম ও শাসক নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণই হলেন أهل الحل والعقد ।

তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং বাস্তবতা:

প্রথম কথা হল, এই তথাকথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সংসদ এবং তাদের বেঁধে দেয়া সিস্টেম অনুযায়ী নির্বাচন..এ সব তারা নিজেরাই সর্বত্র বাস্তবায়ন করে না।

দ্বিতীয় কথা হল, এর মাধ্যমে কেবল জনগণকে খুশি করা ছাড়া দেশের কোন কল্যাণ হয় না। তবে এর মাধ্যমে কার্যত লাভবান হয়, ক্ষমতার মসনদে আরোহী এবং তার সাথে সম্পৃক্ত কতিপয় ব্যক্তিবর্গ। অথচ এরা দেশের সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি নয়। কিন্তু সাধারণ জনগণ যেভাবে চেয়েছে সেভাবেই হয়েছে!!

পাশ্চাত্যের পরিভাষা অনুযায়ী রাজনৈতিক স্বাধীনতার সাথে আরেকটি বিষয় সম্পৃক্ত। তা হল দেশের যে কোন শ্রেণীর মানুষ দল গঠন করে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে পারে। আর দলের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করবে। এ কারণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও বিপরীতমুখী বহু দল-উপদল রয়েছে। যেমন, ডেমক্রাটিক পার্টি, রিপাবলিকান পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, লেবার পার্টি ইত্যাদি।

নির্বাচনে সব দল প্রতিদন্দ্বিতা করে। তারপর কোন এক দল বিজয়ী হলে তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গী, রাজনৈতিক আদর্শ, বিচার ও আইনগত মতাদর্শ ইত্যাদি বাস্তবায়ন করে। তাই দেখা যায়, যখন একদল অন্য দলের উপর বিজয়ী হয় তখন দেশের সর্বসাধারণ সেই দলের সব দৃষ্টিভঙ্গী ও দেশ পরিচালনার নীতির উপর সন্তুষ্ট থাকে না। যারা সে দলের সাথে সম্পৃক্ত কেবল তারাই খুশি থাকে আর অন্যরা চায় এই দল যেন পরবর্তীতে আর ক্ষমতায় না আসে। বরং তারা শাসক দলের বিভিন্ন কার্যক্রম ও দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা ও বদনাম করতে থাকে।

পাশ্চাত্যের বেঁধে দেয়া নিয়ম অনুযায়ী যদি দেশে 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা' প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এতে দেশে রাজনৈতিক প্রতিদন্দ্বিতা সৃষ্টি হয় যা দেশকে এক ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর দিকে নিয়ে যায় না। রাষ্ট্রের কার্যক্রম সর্ব শ্রেণীর

মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। বরং দেখা যায়, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের নামে একদল ক্ষমতায় যাওয়ার পরও তা গ্রহণযোগ্যতা পায় না।

আপনাদের সামনে এর সুস্পষ্ট উদাহরণ রয়েছে। যেমন, আলজেরিয়া, মিশর এবং তুরস্কের কতিপয় ইসলামী দল গণভোটে বিজয়ী হলেও রাষ্ট্র তা মেনে নেয়নি। কারণ ক্ষমতাসীনরা সামরিকপন্থী। তারা গণতন্ত্র চায়, মানবাধিকার চায় কিন্তু ইসলামপন্থীরা বিজয়ী হলে তখন তাদের নিকট তারা আর গ্রহণযোগ্যতা পায় না।

এই জন্যই বলি, হিউম্যান রাইটস, জাতিসংঘ এমন কি পাশ্চাত্যের দেশগুলোও তাদের ঘোষণা অনুযায়ী মানবাধিকার বাস্তবায়ন করেনি। বরং অনেক মৌলিক বিষয়গুলো থেকেও তারা সরে এসেছে যেগুলোর ব্যাপারে তারা আগে হাঁক-ডাক করত। কথিত 'রাজনৈতিক স্বাধীনতা'র ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দেশগুলো, জাতিসংঘ, কাফের এবং মুনাফিক গোষ্ঠি যে পরিমাণ 'মানবাধিকার' লঙ্ঘণ করেছে আলোচনা করতে গেলে তার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে!

রাজনৈতিক সংঘাত আর ক্ষমতার দন্দ্ব নয়। বরং শাসকের জন্য কল্যাণ কামনা ও সদুপদেশ দান:

রাজনীতির ক্ষেত্রে ইসলামী শরী'আত মানব ইতিহাসের সর্বোৎকৃষ্ট ও পরীক্ষিত যে নীতিটি উপাস্থাপন করেছে তা হল, শাসকের জন্য নছীহত তথা কল্যাণ কামনা করা ও সদুপদেশ দেয়া। এটিকে কেবল ইবাদতের অংশ নয় বরং মুসলিম উম্মার উপর ফরজ করে দেয়া হয়েছে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

"দীন-ইসলাম নছীহত বা সদুপদেশ ও কল্যাণ কামনার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য নছীহত হে আল্লাহর রসূল? তিনি

বললেন: "আল্লাহ, তার কিতাব (কুরআন), তার রসূল, মুসলিমদের ইমাম এবং সাধারণ মুসলিমদের জন্য।"[১৬]

সুতরাং মুসলমানদের ইমামদের (শাসক ও নেতৃবৃন্দ) কল্যাণ কামনা ও তাদেরকে সদুপদেশ দেয়া সবার উপর ফরয।

শাসকগণ যদি নছীহত না শুনে তবে তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই এবং ঐ মুসলিমদের মাঝেও কোন কল্যাণ নেই যারা শাসকদের নছীহত করে না। কিন্তু কথা হল, এই নছীহত শাসক পর্যন্ত পৌঁছবে কিভাবে?

ইসলামের প্রথম যুগে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত জনগণের নছীহত পৌঁছার মাধ্যমে ছিল প্রধানত: আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ এবং আহলে শুরা (উপদেষ্টা পরিষদ) যারা এ ক্ষেত্রে কোন কাজটি উপযুক্ত সেটা অনুধাবন করতে পারতেন।

৩) ধর্মীয় স্বাধীনতা:

ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে তারা বলে, মানুষ ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্ম গ্রহণ করবে। অর্থাৎ মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন করবে। তবে অন্যের উপর জোর করে ধর্ম বা কোন ধর্মীয় বিষয় চাপিয়ে দিবে না।

কিন্তু কথা হল, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের উপর যে ধর্ম অবতীর্ণ করেছেন তা হল ইসলাম। এটিই সত্য ধর্ম। যে ব্যক্তি এ ধর্ম অবলম্বন করবে সে মুসলিম। অতএব কেউ যদি বলে, আমি স্বাধীন। আমি ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য ধর্ম গ্রহণ করব। তবে তা মানা হবে না। কেন? উত্তর হল, সে তাহলে একটা পাগল যে কিনা নিজের কল্যাণ বুঝতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে ইহ ও পরকালীন উভয় জীবনে ইসলাম তার জন্য কল্যাণকর। তাকে যদি আমরা ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণের হওয়ার সুযোগ দেই তবে তাকে যেন আমরা জাহান্নামে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

[১৬] মুসলিম, হা/৫৫ ও বুখারী (মুয়াল্লাক), কিতাবুল ঈমান, রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: দীন হল নছীহত (বা সদুপদশে ও কল্যাণ কামনার) উপর প্রতিষ্ঠিত...।

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾

" যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত।" সূরা আলে ইমরান ৩:৮৫।

ছ্বহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

" যে তার দীন পরিবর্তন করল তাকে তোমরা হত্যা করো।"[১৭]

সুতরাং কোন মুসলিম যদি অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয় তাকে হত্যা করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرۡتَدَّ مِنكُمۡ عَن دِينِهِۦ فَسَوۡفَ يَأۡتِي ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ يُحِبُّهُمۡ وَيُحِبُّونَهُۥٓ﴾

"তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে।" সূরা মায়িদাহ ৫:৫৪

কিন্তু একজন অমুসলিম তার ইচ্ছেমত যে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। মানুষকে আমরা ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবো না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদী-খৃস্টানদেরকে তাদের ধর্মের উপর অবিচল থাকার স্বীকৃতি দিয়েছেন। কিন্তু সেই সাথে তিনি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছেন, তাদেরকে আদেশ-নিষেধ করেছেন।

সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা রয়েছে এই শর্তে যে, কেউ ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে পারবে না। কেননা, ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম। আর ইসলামী শরী'আত এসেছে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করতে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে তবে এতে প্রমাণিত হয়ে সে সুবুদ্ধির ধারক নয়।

---

[১৭] ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৯২২

৪) মুক্তচিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা:

জাতিসঙ্ঘ রচিত মানবাধিকার সনদে আরেকটি স্বাধীনতার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা হল, মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা। অর্থাৎ সকল মানুষ স্বাধীন। সুতরাং প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে, সে যা ইচ্ছা তাই বলবে, ইচ্ছামত যে কোন মত প্রকাশ করবে বা যে কোন মতাদর্শ প্রচার করবে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাকে কোন জবাবদাহি করতে হবে না। অথচ ইসলামে শর্তহীনভাবে মুক্তচিন্তা বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নেই।

ইসলামী শরী'আতে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামী শরী'আতে সকলকে এ অধিকার দেয়নি যে, সে যা মনে চায় তাই বলবে। ইসলামী শরী'আত এসেছে মানুষকে মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহবান জানাতে। সকল মানুষের বিচার-বুদ্ধি সমান নয়। সুতরাং মানুষকে যদি এ সুযোগ দেয়া হয় যে, সে যা মনে চায় তাই বলবে বা যে কোন সংশয়-সন্দেহ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিবে তাহলে দেখা যাবে যার ঈমান দুর্বল বা যে ব্যক্তি শয়তানী সংশয়ের জবাব দেয়ার মত যোগ্যতা রাখে না তার বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে বা সমাজে বিপর্যয়-বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়বে।

এ প্রসঙ্গে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর যুগে সংঘটিত একটি ঘটনা:

গুনাইম গোত্রের সুবাইগ ইবনে ইসল নামক এক ব্যক্তি মদীনায় আগমন করল। তার কাছে কিছু বই-পুস্তক ছিল। সে লোকটি কুরআনে আয়াতে মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ) আয়াতগুলোর ব্যাপারে লোকজনকে জিজ্ঞেস করা শুরু করল। বিষয়টি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট অভিযোগ উঠলে তিনি সে ব্যক্তিকে তার কাছে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। আর ইতোমধ্যে তার উদ্দেশ্যে তিনি খেজুরের ডালের কায়েকটি লাঠি প্রস্তুত করলেন। লোকটি উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকটে এসে বসলে-

তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন: কে তুমি?

বলল: আমি আব্দুল্লাহ সুবাইগ

উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু): আমি আব্দুল্লাহ উমর

এরপর তিনি তাকে খেজুরের লাঠি দিয়ে তাকে প্রহার শুরু করলেন। লোকটি আহত হয়ে তার চেহারা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগল। তখন এক পর্যায়ে সে বলল, হে আমীরুল মুমিন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামুন। আল্লাহর কসম, আমার মাথায় যা ছিল তা দূর হয়ে গেছে।”[১৮] অর্থাৎ হে আমীরুল মুমিনীন, আমার মনে যে সব সংশয় ছিল, সেগুলো থেকে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। অতঃপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাকে দেশ থেকে বের করে দিয়ে তাকে লোকজনের সাথে উঠাবসা করতে নিষেধ করে দিলেন যেন, লোকজনের মধ্যে তার খারাপ প্রভাব না পড়ে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ার বুকে কেন পাঠানো হয়েছিলো? নাবী- রসূল পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ যেন মহান আল্লাহর দাসত্ব মেনে নেয়।

সুতরাং কেউ যদি মন যা চায় তাই প্রচার করে মানুষের দীনকে নষ্ট করে দেয় তবে সেটি হবে নাবী-রসূল প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য পরিপন্থী কাজ। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও প্রেরণ করা হয়েছে এ জন্য যে, মানুষ যেন মহান আল্লাহর অনুগত দাসে পরিণত হয়, বিশ্বজাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর সামনে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দেয় এবং ইসলামের শিক্ষা ও দাবিকে বাস্তবায়ন করে।

কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের এই মূলনীতি ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হয় বা নিচের দিকে গর্ত খুঁড়ে যাতে ইসলামের ভীত ধ্বসে পড়ে তবে তাকে থামিয়ে দেয়া অপরিহার্য। সুতরাং আমাদের ইসলামে নিঃশর্ত বাক স্বাধীনতা বা দ্বিধাহীন মত প্রকাশের সুযোগ নেই।

আপনি বিভিন্ন বিষয়ে মত দিতে পারেন কিন্তু তা যেন কুরআন, সুন্নাহ বা ইসলামের কোন মূলনীতিকে কটাক্ষ না করে না হয়।

পক্ষান্তরে আপনি যদি এমন সব মত বা মতাদর্শ প্রচার করেন যা দীনকে আঘাত করে বা দীনের মর্যাদাহানী করে বা মানুষকে বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দেয় তবে সেটি হবে যুগে যুগে নাবী-রসূল প্রেরণের মূলনীতি ও মূল শিক্ষার পরিপন্থী।

---

[১৮] আল আজুররী ফিশ শরীয়াহ পৃষ্ঠা নং ১৫৩ ইবনে বাত্তা ফিল ইবানাহ, পৃষ্ঠা নং ৭৮৯, লালকাঈ ফি শরহে উসূলে ইতিকাদ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াহ ৪/৭০৬

ইসলাম কেন মানুষকে দীনী বিষয়ে শর্তহীনভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দেয়নি?

সব মানুষের ঝোঁক-প্রবণতা সমান নয়। অধিকাংশ মানুষ আবেগ নির্ভর; দলীল নির্ভর নয়। অধিকাংশ মানুষ সব কিছুকে দলীল-প্রমাণ, কল্যাণ-অকল্যাণ, ভালো-মন্দ সব দিক বিবেচনা করে হিসেব করতে সক্ষম হয় না। আবেগী মানুষ আবেগ নির্ভর প্রভাব সৃষ্টিকারী কথাগুলোকেই গ্রহণ করে থাকে।

অনেক সময় দলিল-প্রমাণ না থাকলেও বিচারক দু'জন বিবাদীর মাঝে যে বেশি ভালোভাবে তার সামনে যুক্তি-তর্ক ও বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারে তার পক্ষেই রায় দেয়। যেমন ছ্বহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

তোমরা বিভিন্ন ঝগড়া-বিবাদ নিয়ে আমার নিকট এসে থাকো। (তারপর দেখা যায়) আমার সামনে একজনের বিরুদ্ধে অন্যজন সুন্দরভাবে (তার দাবির পক্ষে) যুক্তি-প্রমাণ পেশ করে। আর তার বক্তব্যের আলোকে আমি যদি কাউকে তার অন্য ভাইয়ের কোন হক দিয়ে দেই তবে তাকে যেন আমি এক টুকরা আগুন দিলাম। সুতরাং তার কর্তব্য হল, তা গ্রহণ না করা।"[১৯]

যদি দীনের বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয় তবে মানুষের মাঝ থেকে দীন বিদায় নিবে, দীন ইসলামের ক্ষেত্রে দুর্বলতা সৃষ্টি হবে, নাবী-রসূলদের আবির্ভাবের প্রভাব এবং সমগ্র বিশ্বচরাচরের মালিক ও স্রষ্টা মহান আল্লাহর দ্বীনের উপর সন্তুষ্ট থাকার বিষয়টি মানুষের মন থেকে উঠে যাবে।

আপনারা জানেন, বর্তমানে যে সব দেশে ধর্মীয় বিষয়ে মত প্রকাশের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সে সব দেশের অনেক মানুষ বাতিল মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে দীন থেকে দূরে সরে গেছে। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করুন। কারণ অধিকাংশ মানুষ আবেগ প্রবণ। তারা যাচায়-বাছাই না করে

---

[১৯] ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৬৮০ ও ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৩

সহজভাবে কথা গ্রহণ করে। তাই আলেমদের করণীয় হল, দীনকে হেফাজতের স্বার্থে বাতিলপন্থীদের ভ্রান্ত কথা-বার্তার জবাব দেয়া। কিন্তু তা আসলে সব সময় সম্ভব হয় না। শর্তহীনভাবে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা মানুষের ধর্ম বিশ্বাসকে নষ্ট করতে ভূমিকা পালন করে অথচ সব মানুষ এ সব ভ্রান্ত সংশয়ের জবাব দেয়ার ক্ষমতা রাখে না।

মোটকথা, আমরা বলব, ইসলামী শরী'আতের আবির্ভাব ঘটেছে সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে। পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী, রাষ্ট্রপ্রধান, সাধারণ জনগণ, বিচারক, বিচার প্রার্থী, আমীর-ফকির, স্বাধীন, দাস, পুরুষ বা নারী সবার জন্য। ইসলাম সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে। পিতা-মাতার অধিকার, সন্তানদের অধিকার, স্বামীর অধিকার, স্ত্রীর অধিকার, এক মুসলিমের কাছে অন্য মুসলিমের অধিকার, অমুসলিমের অধিকার। কোন কাফের যদি তোমার প্রতিবেশী হয় তাহলে তোমার উপর তার কিছু অধিকার রয়েছে। মুসলিম সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধভাবে বসবাসকারী অমুসলিমের অধিকার রয়েছে, ইসলামী সরকারের নিকট নিরাপত্তা লাভকারী অমুসলিমের অধিকার রয়েছে...।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি একটি ছাগল জবাই করলেন। (তারপর তার পরিবারের লোকদেরকে) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি আমার ইহুদী প্রতিবেশীর নিকট গোস্ত উপহার পাঠিয়েছো? আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন:

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

“জিবরাঈল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি উপদেশ দিতেন যে, মনে হল তিনি হয়ত শেষ পর্যন্ত প্রতিবেশীকে সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন।”[২০] তাহলে প্রমাণিত হল যে, ইসলামী শরী'আত অর্থনৈতিক অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, অমুসলিমের অধিকার ইত্যাদি সামগ্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে। তবে এই শর্তে যে সেটা ইসলামী শরী'আত যে কল্যাণ বাস্তবায়ন করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে তার স্বপক্ষে হতে হবে। ইসলামী শরী'আত কেবল পার্থিব কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য

---

[২০] ছ্বহীহ বুখারী, হা/৬০১৪, ৬০১৫ ও ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬২৫, আবু দাউদ হা/৫১৫২, তিরমিযী, হা/১৯৪৩, ইবনে মাজাহ ৩৬৭৩, মুসনাদে আহমদ ৬৪৯৬।

আগমন করেনি, বরং আগমন করেছে ইহ ও পরলৌকিক উভয় জগতের কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। এতে মানুষের জীবন-মরণ, দুনিয়া-আখিরাত উভয় দিকেই কল্যাণ রয়েছে।

মানবাধিকার বিষয়ে এই হল মৌলিক কিছু কথা। যদিও এতটুকু আলোচনা এ বিষয়ের জন্য সার্বিক দিক থেকে যথেষ্ট নয়। তবুও এই বহুল আলোচিত বিষয়টি বুঝার ক্ষেত্রে আমার এ কথাগুলো সহায়ক হবে বলে আশা করি।

এটা নিশ্চিত যে, যে দেশে ইসলামী শরী'আতকে সম্মান করা হয় বা ইসলামী শরী'আতকে ঊর্ধ্বে রাখা হয় বা যে দেশে ইসলামী শরী'আত কায়েম রয়েছে সে দেশে মানবাধিকার সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত হয়।

পক্ষান্তরে যে দেশ ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়নে দুর্বল, সে দেশ মানবাধিকার বাস্তবায়নেও দুর্বল। কারণ, শরী'আত সম্মত মানবাধিকার বাস্তবায়নের বিষয়টি মানুষের বাস্তব জীবনে শরী'আত বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। যখন জুডিশিয়াল রাইটস, ফিনান্সিয়াল রাইটস, সমাজে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা, জুলুম-অত্যাচারের সঠিক বিচার এবং ইসলাম অনুমদিত স্বাধীনতা দেয়া হবে তখন তার অর্থ দাঁড়াবে মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার অর্জন করলো, অর্জন করল তাদের যথার্থ পাওনা।

সর্বজন বিদিত কথা হল, পরিপূর্ণভাবে মানবাধিকার বাস্তবায়নের যুগ হল, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগ এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এর যুগ। তার পরে উমাইয়া-আব্বাসীয় থেকে শুরু করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে দেশে যত বেশি ইসলামী শরী'আত বাস্তবায়িত হয়েছে সে দেশে তত বেশি মানবাধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। মানবাধিকার বিষয়ে বিশাল সমূদ্রের মাঝে এই হল সামান্য ছিটেফোঁটা। আল্লাহর নিকট দুয়া করি, আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদেরকে তার দীনের প্রচারক বানিয়ে দেন। আমরা যেন এ পথে অবিচল থাকতে পারি ও ধৈর্য ধারণ করতে পরি। আরও দুয়া করি, তিনি আমাদেরকে দীনের সেবক, সাহায্যকারী, ইলমে দীনের ধারক-বাহক, মহান আল্লাহর শরী'আত এবং নাবীর সুন্নাতের রক্ষায় অগ্রগামী ভূমিকা পালনকারী বানিয়ে দিন।